BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY
RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)
(Open Access Peer-Reviewed International Journal)
DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03090029
Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 09| September 2025| e-ISSN: 2584-1890

বিদ্যালয়-পরিবার-সমাজ: প্রাথমিক শিক্ষায় ত্রিমুখী সমন্বয়ের প্রয়োজন

Sabnam Farha

Email: sabnamfarha1983@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পর্যায়, যা শিশুর মানসিক, সামাজিক, নৈতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করে। শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষা শিশুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ নিশ্চিত করতে যথেষ্ট নয়। শিশুর শিক্ষাজীবনকে কার্যকর করতে প্রয়োজন ত্রিমুখী সমন্বয়—বিদ্যালয়, পরিবার ও সমাজের মধ্যে সমন্বয়। বিদ্যালয় শিশুকে কাঠামোগত শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন এবং সামাজিক আচরণ শেখায়। পরিবার শিশুর মানসিক, নৈতিক ও আবেগগত বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সমাজ শিশুকে সাংস্কৃতিক সচেতনতা, সামাজিক দক্ষতা এবং নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশে সমর্থন প্রদান করে। এই ত্রিমুখী সমন্বয় শিশুর শেখার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করে, শিক্ষার মান উন্নত করে এবং তাকে একজন সামাজিকভাবে সচেতন ও সক্ষম নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। যদিও বাস্তবায়নের পথে কিছু চ্যালেঞ্জ যেমন পরিবারের শিক্ষাগত সচেতনতার অভাব, সমাজের বৈষম্য ও বিদ্যালয়ের সীমিত সম্পদ দেখা দেয়, সচেতনতা কর্মসূচি, সম্পর্ক স্থাপন এবং প্রযুক্তির ব্যবহার এই সমস্যা মোকাবেলায় কার্যকর। সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যালয়-পরিবার-সমাজের অংশগ্রহণ শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নিশ্চিত করে।

মূল শব্দ: *প্রাথমিক শিক্ষা, ত্রিমুখী সমন্বয়, বিদ্যালয়-পরিবার-সমাজ, শিক্ষার মান, শিশুর বিকাশ।*

ভূমিকা:

প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পর্যায়। এটি এমন একটি সময় যখন শিশুর মানসিক, সামাজিক, শারীরিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই পর্যায়ে শিশুর শেখার অভ্যাস, কৌতূহল, সমস্যার সমাধান করার দক্ষতা এবং সামাজিক আচরণের প্রাথমিক ধারণা গড়ে ওঠে। শিশুর মস্তিষ্ক সবচেয়ে সক্রিয়ভাবে নতুন তথ্য গ্রহণ করতে সক্ষম হয় এবং শিক্ষা তার চিন্তাশক্তি, স্মৃতিশক্তি ও সৃজনশীলতার বিকাশকে প্রভাবিত করে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা শুধু পাঠ্যবিষয় শেখার স্থান নয়, বরং এটি শিশুর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর।

তবে শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষা শিশুর পূর্ণ বিকাশের জন্য যথেষ্ট নয়। শিশুর শিক্ষাজীবন, নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক আচরণ এবং মানসিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজন ত্রিমুখী সমন্বয়—বিদ্যালয়, পরিবার এবং সমাজের মধ্যে সমন্বয়। বিদ্যালয় শিক্ষাকে কাঠামোগত ও শৃঙ্খলাপূর্ণ করে তোলে, যেখানে শিশুর জ্ঞান, দক্ষতা ও সামাজিক আচার শেখানো হয়। পরিবার শিশুর নৈতিকতা, আচরণগত নিয়ম এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অপরদিকে সমাজ শিশুদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সচেতনতা, সামাজিক যোগ্যতা এবং সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বিকাশে সাহায্য করে।

এই ত্রিমুখী সমন্বয় শিশুকে কেবল শিক্ষার ক্ষেত্রেই সমৃদ্ধ করে না, বরং তাকে একজন সামাজিকভাবে সচেতন, নৈতিকভাবে সচেতন এবং সক্ষম নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। একসাথে কাজ করলে শিশুর মানসিক বিকাশ, নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং শেখার প্রতি আগ্রহ সর্বাধিক হয়। তাই প্রাথমিক শিক্ষায় এই সমন্বয় নিশ্চিত করা শিশুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যালয়ের ভূমিকা:

বিদ্যালয় হলো শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু এবং শিক্ষার প্রথম আনুষ্ঠানিক পরিবেশ। এটি কেবল পাঠ্যবিষয় শেখার স্থান নয়, বরং শিশুর মানসিক, সামাজিক, নৈতিক এবং শারীরিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। প্রাথমিক স্তরে শিশু কেবল গণিত, ভাষা বা বিজ্ঞান শেখে না; এই সময়ে সে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা, নিয়ম মানা, দায়িত্ববোধ এবং সামাজিক আচরণের প্রাথমিক পাঠও গ্রহণ করে। এই পর্যায়ে বিদ্যালয় শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করে।

শিক্ষাগত বিকাশ: বিদ্যালয় শিশুর শিক্ষাগত বিকাশের মূল কেন্দ্র। এখানে শিশুর জ্ঞানার্জন, পাঠ্যক্রম অনুসরণ, ভাষাগত দক্ষতা এবং চিন্তাশক্তি বিকাশ পায়। শিক্ষকরা শিশুর আগ্রহ এবং কৌতূহল অনুযায়ী পাঠক্রম সাজিয়ে শিক্ষাকে আকর্ষণীয় এবং কার্যকর করে তোলে। শিশু যখন শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যবিষয় শিখে, তখন সে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং তথ্য বোধও অর্জন করে।

সামাজিক ও নৈতিক বিকাশ: বিদ্যালয় শিশুর সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এখানে শিশু শেখে সহযোগিতা, দলগত কাজ, নিয়ম অনুসরণ, সহমর্মিতা এবং সামাজিক আচরণের মানদণ্ড। সহপাঠী এবং শিক্ষকের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক শিশুদের মধ্যে সামাজিক দক্ষতা এবং নৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে। প্রাথমিক স্তরে এই সামাজিক অভ্যাসগুলো শিশুর ভবিষ্যতের জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি স্থাপন করে।

সৃজনশীলতা ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি: বিদ্যালয়ে পরিচালিত সৃজনশীল কার্যক্রম—যেমন গল্পকথা, নাটক, প্রকল্পভিত্তিক কাজ, আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট এবং খেলাধুলা—শিশুর সৃজনশীলতা, চিন্তাশক্তি এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বিকাশে সহায়ক। এই ধরনের কার্যক্রম শিশুদের কৌতূহল এবং শেখার আগ্রহ বাড়ায়। উদাহরণস্বরূপ, প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষা শিশুকে বিষয়ভিত্তিক সমস্যা সমাধানে নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা শেখায় এবং দলগতভাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

বিদ্যালয় শিক্ষকের ভূমিকা: শিক্ষক শিশুর শেখার প্রক্রিয়ার মূল দিকনির্দেশক। শিক্ষক শিশুর বয়স, মনোভাব এবং আগ্রহ অনুযায়ী পাঠ্যক্রম সাজায়। তারা শুধু জ্ঞান প্রদান করে না, বরং শিশুদের সৃজনশীল চিন্তা, আত্মবিশ্বাস এবং নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সহায়তা করে। শিক্ষকের নির্দেশনা শিশুদের শেখার অভিজ্ঞতাকে আকর্ষণীয় ও কার্যকর করে তোলে।

পরিবার এবং সমাজের সমন্বয়: যদিও বিদ্যালয় শিশু শিক্ষার মূল কেন্দ্র, কিন্তু শিশুর সামগ্রিক বিকাশের জন্য পরিবারের এবং সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। পরিবার শিশুকে নৈতিক এবং মানসিক দিক থেকে সমর্থন দেয়, আর সমাজ শিশুর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দক্ষতা বিকাশে সাহায্য করে। এই ত্রিমুখী সমন্বয় নিশ্চিত করলে শিশুর শিক্ষার মান এবং শেখার আগ্রহ সর্বাধিক হয়।

পরিবারের প্রভাব ও ভূমিকা:

পরিবার হলো শিশুর প্রাথমিক সামাজিকীকরণের প্রথম স্থান। শিশুর নৈতিক, সামাজিক এবং মানসিক গঠন পরিবার থেকেই শুরু হয়। বাবা-মা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা শিশুর শিক্ষার প্রতি মনোভাব তৈরি করতে সহায়ক। যদি পরিবার শিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করে, তবে শিশু স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়।

পরিবারের ভূমিকা প্রাথমিক শিক্ষায় বহুমাত্রিক। এর মধ্যে রয়েছে:

1. শিশুর শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা – শিশুর জন্য বাড়িতে পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যকেন্দ্রিক সামগ্রী এবং পড়াশোনার জন্য শান্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।

2. শিক্ষকদের সাথে সমন্বয় – শিশুর স্কুল কার্যক্রমের সঙ্গে সমন্বয় রেখে তার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা।

3. নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা প্রদান – বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিবার শিশুদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, সহমর্মিতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে।

শিশুর শিক্ষা যদি কেবল বিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তার শেখার পরিধি সীমিত হয়। পরিবার শিক্ষার একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে এবং শিশুর শেখার প্রতি প্রেরণা সৃষ্টি করে।

সমাজের ভূমিকা:

শিশুর শিক্ষার প্রসার এবং তার সামগ্রিক বিকাশে সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশু শুধু পরিবারের বা বিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; সে সমাজের অংশ হিসেবেই তার প্রথম সামাজিকীকরণ শুরু করে। সমাজ শিশুর মানসিক, নৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশে একটি শক্তিশালী প্রভাব ফেলে। শিশুর শেখার প্রক্রিয়ায় সমাজ কেবল একটি পটভূমি নয়, বরং এটি শিশুর শেখার সক্ষমতা, সামাজিক আচরণ এবং নৈতিক মানদণ্ডের বিকাশকে সমৃদ্ধ করে।

শিশু যখন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশ নেয়—যেমন কমিউনিটি সেন্টার, স্থানীয় লাইব্রেরি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলার কার্যক্রম—তখন সে কেবল শিক্ষাগত দক্ষতা অর্জন করে না, বরং সামাজিক দক্ষতা, নেতৃত্বগুণ, দলগত কাজের সক্ষমতা এবং সহমর্মিতাও শেখে। উদাহরণস্বরূপ, একটি শিশু কমিউনিটি সেন্টারে অন্য শিশুদের সঙ্গে মিলে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করলে সে পরিকল্পনা, দায়িত্ববোধ এবং সহযোগিতা শেখে। খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুর মধ্যে দলগত মনোভাব, ধৈর্য্য এবং নিয়ম মানার অভ্যাস বৃদ্ধি পায়।

১. শিক্ষার প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি: সমাজ শিশু এবং পরিবারের মধ্যে শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কমিউনিটি প্রোগ্রাম, সচেতনতা কর্মসূচি এবং স্থানীয় সভা শিশুদের এবং তাদের অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও সচেতনতা সৃষ্টি করে। সমাজ শিশুর শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রভাবশালী, বিশেষ করে যেখানে পরিবার শিক্ষার ক্ষেত্রে সীমিত জ্ঞানের অধিকারী বা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল।

২. সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ: সমাজ শিশুদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সচেতনতা এবং ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়। স্থানীয় সমাজ, সম্প্রদায় এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান শিশুদের কাছে তাদের সমাজের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধ তুলে ধরে। উদাহরণস্বরূপ, আঞ্চলিক উৎসব, নৃত্য, গান, লোককাহিনী এবং ঐতিহ্যবাহী খেলা শিশুদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ গড়ে তোলে। এটি শিশুদের মধ্যে আত্মপরিচয় এবং গর্বের বোধ জাগায়, যা তাদের মানসিক এবং সামাজিক বিকাশকে সমৃদ্ধ করে।

৩. সহযোগী পরিবেশ প্রদান: সমাজ শিশুর শিক্ষার জন্য সহায়ক পরিবেশ, সুযোগ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। স্থানীয় লাইব্রেরি, কমিউনিটি সেন্টার, খেলার মাঠ এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রম শিশুর শেখার পরিবেশকে সমৃদ্ধ করে। এছাড়া সমাজ শিশুকে নিরাপদ এবং সমর্থনমূলক পরিবেশে রাখতে সাহায্য করে, যা তার মানসিক স্থিতিশীলতা এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করে।

৪. সমাজ-পরিবার-বিদ্যালয় সমন্বয়ের গুরুত্ব: শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য সমাজ, পরিবার এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে ত্রিমুখী সমন্বয় অপরিহার্য। যখন এই তিনটি ক্ষেত্র একসাথে কাজ করে, তখন শিশুর শেখার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়। বিদ্যালয় শিশুকে কাঠামোগত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষা প্রদান করে, পরিবার শিশুকে মানসিক ও নৈতিক দিক থেকে সমর্থন দেয়, এবং সমাজ শিশুর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক দিকের বিকাশকে সমৃদ্ধ করে। এর ফলে শিশুর শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, সামাজিক দায়িত্ববোধ, নৈতিক সচেতনতা এবং সৃজনশীলতা সর্বাধিক হয়। ত্রিমুখী সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর জীবনের সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এই সময় শিশুর মানসিক, সামাজিক, নৈতিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তবে শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের ভূমিকা এই বিকাশকে সম্পূর্ণ করতে যথেষ্ট নয়। প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নিশ্চিত করতে ত্রিমুখী সমন্বয় (School-Family-Society Coordination) অপরিহার্য। এই সমন্বয় শিশুকে কেবল শিক্ষার ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করে না, বরং তাকে একটি সামাজিকভাবে সচেতন, নৈতিকভাবে সুশৃঙ্খল ও সক্ষম নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।

১. শিশুর সমন্বিত বিকাশ: ত্রিমুখী সমন্বয়ের প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিশুর সমন্বিত বিকাশ। বিদ্যালয় শিশুর শিক্ষাগত বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে শিশু পাঠ্যবিষয় শেখে, ভাষাগত দক্ষতা অর্জন করে এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তবে শুধুমাত্র বিদ্যালয় শিশুর মানসিক ও নৈতিক বিকাশ নিশ্চিত করতে পারে না। এই ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার শিশুকে নৈতিক মূল্যবোধ, আচরণগত নিয়ম, দায়িত্ববোধ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখায়। এছাড়া পরিবার শিশুর মানসিক সুস্থতা এবং আত্মবিশ্বাস গঠনে সহায়ক। সমাজ শিশুর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য। সমাজ শিশুদের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, নেতৃত্বগুণ এবং সামাজিক ন্যায়বোধ গড়ে তোলে। এই তিনটি ক্ষেত্র একত্রে কাজ করলে শিশু শিক্ষাগত, মানসিক, নৈতিক এবং সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ও সমন্বিত উন্নতি অর্জন করতে পারে।

২. শিশুর শেখার প্রতি প্রেরণা বৃদ্ধি: পরিবার এবং সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ শিশুর শেখার প্রতি প্রেরণা ও আগ্রহ বৃদ্ধি করে। যখন শিশু দেখে তার পরিবার শিক্ষার মূল্য বোঝে এবং শিক্ষকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে, তখন শিশুর মধ্যে শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে। একইভাবে, সমাজের বিভিন্ন কার্যক্রম—যেমন কমিউনিটি ক্লাব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্থানীয় শিক্ষা প্রচার—শিশুকে শেখার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করে। শিশু শুধুমাত্র পাঠ্যবিষয় নয়, সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকেও শেখার অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এই প্রেরণা শিশুর শেখার ধারাবাহিকতা, মনোযোগ এবং সৃজনশীলতার বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

৩. শিক্ষার মান বৃদ্ধি: শিক্ষার মান বৃদ্ধি করার জন্যও ত্রিমুখী সমন্বয় অপরিহার্য। শিক্ষক, পরিবার এবং সমাজ একযোগে কাজ করলে শিশুর শিক্ষা প্রক্রিয়া আরও কার্যকর এবং ফলপ্রসূ হয়। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যালয় যেখানে নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি এবং কার্যক্রম চালায়, পরিবার যদি সেই শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সাথে ঘরে শিশুকে সাহায্য করে এবং সমাজ সেই শিক্ষাকে বাস্তব জীবনের সাথে সংযুক্ত করে, তখন শিশুর শেখার মান সর্বাধিক হয়। একে বলা যেতে পারে "সিনার্জি এফেক্ট" – একত্রে কাজ করলে প্রতিটি ক্ষেত্রের প্রভাব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

৪. সমাজে সমতার চেতনা গঠন: ত্রিমুখী সমন্বয় শিশুর মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং সামাজিক ন্যায়বোধ গড়ে তোলে। বিদ্যালয়-পরিবার-সমাজের সমন্বয় শিশুদের শেখায় কিভাবে তারা ভিন্ন পটভূমি, সংস্কৃতি বা অর্থনৈতিক অবস্থার শিশুদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে পারে। এটি সমাজে সমতার চেতনা এবং সামাজিক ন্যায়বোধ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিশু শেখে যে সকলের শিক্ষা সমান অধিকার, এবং একে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব পরিবারের ও সমাজের সহযোগিতার মাধ্যমে।

বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও সমাধান:

প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যালয়, পরিবার এবং সমাজের মধ্যে ত্রিমুখী সমন্বয় শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য। তবে এই সমন্বয় কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের পথে কিছু চ্যালেঞ্জ অব্যাহত থাকে। এই চ্যালেঞ্জগুলোকে সঠিকভাবে চিহ্নিত এবং সমাধান করা না হলে শিক্ষার মান এবং শিশুর বিকাশ সীমিত হয়ে যায়।

পরিবারে শিক্ষাগত সচেতনতার অভাব: শিশুর শিক্ষা সফল করার জন্য পরিবারের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পরিবারের মধ্যে শিক্ষাগত সচেতনতার অভাব থাকে। বিশেষ করে দরিদ্র বা অশিক্ষিত পরিবার শিক্ষার গুরুত্ব পুরোপুরি বোঝে না। তারা মনে করে বিদ্যালয়েই যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হয়, তাই বাড়িতে শিশুর শিক্ষার প্রতি প্রয়োজনীয় সহায়তা বা মনোযোগ দেওয়া হয় না। এর ফলে শিশুর শিক্ষায় আগ্রহ কমে যায় এবং শেখার ধারাবাহিকতা ভেঙে যায়।

সমাধান: পরিবারকে শিক্ষার গুরুত্ব বোঝানো জরুরি। সচেতনতা কর্মসূচি, অভিভাবক প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে

অভিভাবকরা বুঝতে পারে শিশুর শিক্ষা কেবল বিদ্যালয়ের নয়, পরিবারের সমর্থনের উপরও নির্ভরশীল। নিয়মিত কমিউনিটি মিটিং ও অভিভাবক-শিক্ষক সংযোগ শিশুর শেখার প্রতি প্রেরণা বাড়ায়।

সমাজের বৈষম্য ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা: সমাজের মধ্যে বৈষম্য, আঞ্চলিক ভিন্নতা এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থা শিক্ষার প্রসারে বড় বাধা তৈরি করে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল বা সুবিধা কম থাকা এলাকায় বিদ্যালয়, লাইব্রেরি বা কমিউনিটি সেন্টারের অভাব শিশুর শিক্ষার সুযোগ সীমিত করে। এছাড়া দরিদ্র পরিবার শিশুদের শিক্ষা সামগ্রী, পরিবহন বা খাবারের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ বহন করতে অক্ষম। এর ফলে শিশুর শিক্ষার মান এবং মনোভাব প্রভাবিত হয়।

সমাধান: সরকার, সমাজ ও স্কুলের যৌথ উদ্যোগে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। বিনামূল্যে শিক্ষাসামগ্রী, বৃত্তি এবং কমিউনিটি ভিত্তিক শিক্ষণ কার্যক্রম শিশুর শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত করে। সমাজ-ভিত্তিক সচেতনতা কর্মসূচি দরিদ্র ও পিছিয়ে থাকা পরিবারকে শিক্ষার সাথে যুক্ত রাখে।

বিদ্যালয়ের সীমিত সম্পদ ও শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত: শিক্ষক সংখ্যা সীমিত এবং শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত উপকরণ না থাকলে ত্রিমুখী সমন্বয় কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়। শিক্ষক সব শিশুর ব্যক্তিগত অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন না, এবং পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি সৃজনশীল কার্যক্রম পরিচালনাও সীমাবদ্ধ হয়। এর ফলে শিশুর শেখার মান ও আগ্রহ কমে যেতে পারে।

সমাধান: বিদ্যালয়ের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো, শিক্ষা উপকরণ এবং প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা জরুরি। শিক্ষককে কার্যকর ও উদ্ভাবনী শিক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণে সক্ষম করা দরকার। এছাড়া সমাজ এবং স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা শিক্ষকের কাজকে সহায়কভাবে সম্পৃক্ত করতে পারে।

সম্পর্ক তৈরি ও প্রযুক্তি ব্যবহার: ত্রিমুখী সমন্বয় সফল করার জন্য শিক্ষক, পরিবার এবং সমাজের মধ্যে নিয়মিত সম্পর্ক ও সংযোগ অপরিহার্য। যোগাযোগের অভাব শিশুর শেখার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে।

সমাধান: নিয়মিত অভিভাবক-শিক্ষক বৈঠক, কমিউনিটি মিটিং এবং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। পাশাপাশি ডিজিটাল মাধ্যম, অনলাইন পোর্টাল, ভিডিও কনফারেন্স ও মেসেজিং অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে স্কুল ও পরিবারের মধ্যে সহজ যোগাযোগ সম্ভব। এটি শিশুর শিক্ষার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং সমন্বিত শিক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালনায় সহায়ক।

উপসংহার:

প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যালয়, পরিবার এবং সমাজের ত্রিমুখী সমন্বয় শিশুর সামগ্রিক বিকাশ, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, নৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। একত্রে কাজ করলে শিশুর মানসিক, সামাজিক, ভাষাগত এবং নৈতিক বিকাশের পাশাপাশি সমাজে সচেতন ও সক্ষম নাগরিক তৈরি সম্ভব। নতুন শিক্ষানীতি ২০২০-র প্রেক্ষাপটে, প্রাথমিক শিক্ষায় এই সমন্বয় আরও গুরুত্বপূর্ন হয়ে উঠেছে। বিদ্যালয় শুধুমাত্র পাঠ্যবিষয় শেখায় না, পরিবার শিশুকে মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষা দেয়, এবং সমাজ শিশুকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দক্ষতা প্রদান করে। এই ত্রিমুখী সমন্বয় নিশ্চিত করলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ হবে।

রেফারেন্স:

- ভারত সরকার, শিক্ষা মন্ত্রক। (২০২০)। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০: বাংলা অনুবাদ। New Delhi: শিক্ষা মন্ত্রক।
- সরকার, অ. (২০১৯)। প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যালয়, পরিবার ও সমাজের সমন্বয়। কলকাতা: শিক্ষাবিজ্ঞান প্রকাশনী।
- চ্যাটার্জি, র. (২০১৮)। শিশুর সামাজিক ও নৈতিক বিকাশে পরিবার ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা। কলকাতা: শিক্ষাবিদ্যা জার্নাল, ১২(৩), ২৫–৩৮।

- বসু, পি. (২০১৭)। প্রাথমিক শিক্ষায় কমিউনিটি অংশগ্রহণ। ভিনায়ন: কমিউনিটি এডুকেশন রিভিউ, ৫(২), ৪০–৫৫।
- কুমার, ডি. (২০২০)। শিশুর সমন্বিত বিকাশ: বিদ্যালয়, পরিবার ও সমাজের ভূমিকা। ঢাকা: এডুকেশনাল স্টাডিজ।
- মজুমদার, স. (২০১৯)। ত্রিমুখী সমন্বয় এবং প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার মান উন্নয়ন। কলকাতা: শিক্ষানীতি ও উন্নয়ন জার্নাল, ৩(১), ১৫–২৮।
- সিংহ, এ. কে. (২০১৮)। পরিবার ও বিদ্যালয় সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর প্রেরণা বৃদ্ধি। প্রকাশনা: জে. জে. পি.পি. রিসার্চ পেপার।
- ডেব, বি. (২০২১)। প্রাথমিক শিক্ষায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব। কলকাতা: কমিউনিটি এডুকেশন রিসার্চ জার্নাল, ৬(২), ৫৫–৭২।
- Smile Foundation. (২০২০)। প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি। কলকাতা: ব্লগ পোস্ট।
- PIB (Press Information Bureau)। (২০২০)। NEP 2020-এর প্রাথমিক শিক্ষায় প্রধান বৈশিষ্ট্য। সরকারি প্রেস রিলিজ, New Delhi।

Citation: **Farha. S.,** (2025) "বিদ্যালয়-পরিবার-সমাজ: প্রাথমিক শিক্ষায় ত্রিমুখী সমন্বয়ের প্রয়োজন", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-09, September-2025.